যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

কলকাতা চাকচিক্যের শহর। যেখানে মানুষের জীবনে পোশাক-আশাক কিংবা হেয়ারস্টাইল অনেকটাই ম্যাটার করে। শহর জুড়ে বিজ্ঞাপনের চক্করে পড়ে মানুষ ভুলেই যায় পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের কথা, নিরোগ জীবনের কথা। বিশেষজ্ঞের কথায়, উচ্চমাত্রার ফাইবারের উপস্থিতির জন্য ভুট্টা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভুট্টার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আলঝাইমার্স রোগ প্রতিরোধ করে। তবু ভুট্টা বিক্রেতার কোনও চাকচিক্য নেই। মানুষ নিজের ভালো নিজেই বোঝে, কিন্তু কবে থেকে...

ফোটো: **আশিসকান্তি সোম** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

ইন্দ্রাণী দত্ত (অভিনেত্রী)

কলকাতা এমন একটা শহর যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। আমি কখনও আলাদা করে কিছু ভাবিই না যে কলকাতাকে এই কারণে ভালোবাসব আর ওই কারণে ভালোবাসব না। কিন্তু যখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাই খুব মনখারাপ লাগে। তখন বুঝতে পারি এই শহরটার প্রতি আমার টান কতটা। তাই চাই, কলকাতার আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক, আরও সুবিধা বাড়ুক। যানজটের ঝামেলা কমুক। জ্যামে পড়ে অনেক জায়গায় কমিটমেন্ট মিস করতে হয়। যে রাস্তাটা আধ ঘণ্টায় পৌঁছনো যায় কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে আরও আধঘণ্টা পরে গিয়ে হয়তো সেখানে পৌঁছলাম। এটা খুবই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই শহরে প্রত্যেকেরই কাজের চাপ, সেখানে এই জ্যামের সমস্যা খুবই। আর একটা সমস্যা হল অ্যাক্সিডেন্টের মাত্রা দিন কে দিন খুবই বাড়ছে। যদিও শহরে গাড়ির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কিন্তু রাস্তাও তো বাড়ছে। সেই বিষয়টাতে একটু নজর দেওয়া উচিত। আমি চাই কলকাতা সব দিক থেকে আরও নিরাপদ হোক। স্পেসিফিকভাবে নারীদের নিরাপত্তা বা কোনও নির্দিষ্ট দিক নিয়ে বলছি না চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই সবদিক থেকে আরও নিরাপত্তা বাড়া দরকার।

পলিউশনও তো বাড়ছে দিনদিন। ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে। কিন্তু এর থেকে রেমিডির কিছু একটা উপায় তো বের করতে হবে। সিটিকে ক্লিন রাখা নিয়ে আরও অনেক ভাববার দরকার আছে। বিদেশে দেখেছি গ্রিন মানে সেখানে চোখ গেলে মনটা প্রশান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে দেখেছি যে গ্রিন-এর ওপর যে ময়লা লেয়ার পড়ে থাকে তা কিন্তু নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। যদিও ডিসিপ্লিন মেইনটেন করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই ভূমিকা আছে। সব দায় তো প্রশাসনের নয়। শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরও।

আমার জন্ম কলকাতাতেই। ছোটবেলার কলকাতা আর এখনকার কলকাতায় বিরাট পার্থক্য। তখন এত রাস্তা ছিল না, এত গাড়ি ছিল না। পলিউশন হয়তো তখনও ছিল তবে এখন গাড়িঘোড়া বেড়েছে, মানুষ বেড়েছে শহরে, তার তো একটা প্রভাব থাকবেই। তবু এই শহরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল আর থাকবেও।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

‘সবার আমি ছাত্র’

তমাল ভৌমিক

ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া— ট্রেনে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছি তাও বছর সাতেক হল। আমার মনে হয় এ পৃথিবীতে ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা সব বিষয়েই অল্প-বিস্তর জ্ঞান রাখে, শুধু আলোচনা শুরু হবার অপেক্ষা মাত্র (তবে সবাই নয়)। সে তিন তালাক হোক বা খুচরোর সমস্যা, আলোচনা শুরু হলেই সরগরম হয়ে যায় চারপাশের পরিবেশ। ব্যান্ডেল থেকে অমিয়দা, সুপ্রতিম আর আমি একসাথে যাতায়াত করছি তাও বছর চারেক হল। অমিয়দার ক্যারেক্টারটাই এমন, যে জানে কম বলে বেশি। অফিসে নতুন বস জয়েন করা থেকে শুরু করে কোনও স্পেশাল ট্রেনিং কোনটাকেই গুরুত্ব দেয় না অমিয়দা। তার এক অদ্ভুত কথা, ‘এরা আর আমাকে কী শেখাবে?’

হাওড়ায় নেমে আমি আর অমিয়দা ধর্মতলার বাস ধরি আর সুপ্রতিম শ্যামবাজারের। ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরার আগে আমাদের ডেইলি রুটিন হল হাওড়া স্টেশনে নেমে এক রাউন্ড চা খাওয়া। যেখানেই যাক অমিয়দার ভেতর একটা জিনিস স্পষ্ট যে এই পৃথিবীতে সে জানে না এমন কিছু নেই। বাসে উঠে অমিয়দাকে কোনওদিনই খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারন রোজই ওই সিনিয়ার সিটিজেনের সিটটাতে যা হোক করে অ্যাডজাস্ট করে নেন। প্রবলেম হলে আমার হয়।

এমনভাবে এত বছর কাটলেও, একবছর আগের একটা ঘটনা আমাকে টলিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ধর্মতলার অফিস থেকে ডালহৌসির দিকে হাঁটছিলাম। আসলে টিফিনের ব্রেকটাতে আমি আর অমিয়দা একটু সিগারেট খেতে খেতে দু’চার পা হেঁটে আসি। সেদিনও যথারীতি হাঁটতে বেরিয়েছি হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তে কেমন যেন বেমানান লাগলো। একটা নামী স্কুলের বাস থেকে একটা স্কুল ড্রেস পড়া ছেলে নামল। তারপর আমাদের এখানে যে পাগলটা থাকে তাকে একটা সুন্দর

গিফট প্যাক দিল। আমি বা অমিয়দা কেউই ব্যাপারটা বুঝলাম না। ভাবলাম ভিখারী ভেবে হয়তো কিছু দিচ্ছে। তবুও আমরা একটু কৌতূহলবশেই সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী! ছেলেটি যা বলল তাতে আমার তো গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে গেল। ছেলেটি বলল, ‘কাকু, আমার মা বলেছে যাঁর কাছ থেকেই কিছু শিখবে, জানবে সেই তোমার টিচার। ছোট-বড় সবার কাছ থেকেই শেখার আছে। এই কাকুটা রোজ ওই গাছগুলোতে জল দেয়। বাসে যেতে যেতে ওঁকে রোজ দেখতাম। তারপরই আমি বাড়ির ছাদে বাগান করি। তাই তিনিও আমার শিক্ষক। আজ শিক্ষক দিবস তাই ওঁকেও উপহার দিতে এসেছি।’ আমরা আর কিছু বলার মত অবস্থায় রইলাম না। আমার শুধু সুনির্মল বসুর সেই কবিতাটা মনে পড়ছিল— ‘সবার আমি ছাত্র’...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রসেবশে গড়িয়াহাট

সৈকত ঘোষ

এবারে গল্পটা একটু অন্যভাবে শুরু করব। ধরুন কোনও এক ছুটির দিন, হতে পারে সেটাই আপনার অদেখা-অজানা স্বাধীনতা দিবস। বাঙালি আবেগে ভাসতে ভাসতে গুরুজির নাম নিয়ে সবান্ধব কিংবা একাই বেরিয়ে পড়লেন রাজপথে। তারপর কিছুটা এপাং ওপাং ঝপাং করে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার ক্রস করে মান্না দে-র স্টাইলে গেয়ে উঠলেন আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না। ব্যস, এতক্ষণ বহু কষ্টে চেপেচুপে রাখলেও এবার পেটের মধ্যে ছুঁচোর ডন শুরু। আর বাকিদেরও মন চঞ্চল। খিদে পেটে যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা যায় না সেটা বাঙালির চেয়ে ভালো আর কে জানবে...

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, আমরা খাব তোমরা বাদ— এসব বিভাজন ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে সকলে মিলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কথায় আছে, বন্ধু বন্ধু ভাই ভাই, একসাথে চালভাজা খাই। তাহলে আর কী, খিদে যখন পেয়েছে আর মন যখন বলছে তখন ঢুকেই পড়া যাক গড়িয়াহাটের 'ভজহরি মান্না'তে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই আপনার জন্য সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। ভরপুর বাঙালিয়ানা আর একটা অদ্ভুত নস্টালজিক গন্ধ আপনাকে আবেগপ্রবণ করে দেবে। মনের ভেতর হঠাৎ বৃষ্টি নামলে টাটকা তাজা খেতে মজা কড়কড়ে ইলিশ মাছ ভাজা, সাথে গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি নিয়ে ইনিংস শুরু করতেই পারেন। সত্যি বলছি, আমার মতো আপনিও ঠাকুমাকে বড্ড মিস করবেন। এখানকার ইন্টিরিয়র ডিজাইন থেকে খাবার থালা এমনকী চেয়ার-টেবিলেও সাবেকিয়ানার ছাপ যে কাউকে মুগ্ধ করবে। পুঁইশাক, শুক্ত, ইঁচড়ের ডালনা, মোচার ঘন্ট— এক কথায় এ স্বাদ ভোলার নয়। এখানকার পাবদা মাছের ঝাল একবার খেলে আপনাকে আঙুল চাটতেই হবে। আর শেষ পাতে মালপোয়া, ক্ষীরকদম আর রসমালাই মাস্ট। আপনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাঙালি স্বাদের জাদুতে আচ্ছন্ন হবেন এ-কথা বলাই বাহুল্য। আর গড়িয়াহাট যখন এসেই পড়েছেন তখন হিন্দুস্তান পার্কের 'তেরো পার্বণ' থেকে একবার না ঘুরে আসলে নয়। এখানকার ইলিশ মাছ ভাজা, কাঁচা আম দিয়ে ইলিশ, ইলিশ মাছের মুইঠা— আহা ইলিশের এক অনন্য আয়োজন। পছন্দমতো বেছে নিন আর চেটেপুটে খান। মনে রাখবেন মন ভালো করতে সুস্বাদু খাবারের কোনও বিকল্প নেই। তবে কানে কানে একটা সিক্রেট বলে রাখি যাই হোক চিংড়ির কাটলেটে এক কামড় না লাগিয়ে যেন উঠবেন না। তবে হ্যাঁ, যতই সুগার থাকুক বা স্ট্রিক্ট ডায়েট এখানকার রাবড়ি মিস করলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। আর যদি গোলপার্কের দিক থেকে এক্সপ্লোর করা শুরু করেন তবে 'কষে কষা' আপনার রসনা তৃপ্তির সঠিক ডেস্টিনেশন। এই গরমে আমপোড়া শরবত সাথে মোচার চপ— ১০০% বাঙালিয়ানার আর কী হতে পারে? সুন্দর পরিষেবা আর ভেরিয়েবল মেনু এদের ইউএসপি। মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, বেগুন ভাজা, ঝিঙে-আলু পোস্ত এবং এঁচোর-চিংড়ি এখানকার ফেমাস। খেয়ে দেখতে পারেন চিতল মাছের মুইঠা, দই ইলিশ কিংবা কচি পাঁঠার ঝোল। বিশ্বাস করুন চাইনিজ বা কন্টিনেন্টাল ছেড়ে নতুন করে বাংলা খাবারের প্রেমে পড়ে যাবেন। তবে প্রেম আর একটু জমাতে চাইলে এখানকার স্পেশাল আম-কাসুন্দি চিংড়ি এবং ডাব চিংড়ি খেতে ভুলবেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম কলকাতায় যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের হট ফেভারিট এই মেনু দুটো। শেষপাতে জলপাইয়ের চাটনি আর নলেন গুড়ের আইসক্রিম না খেলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর রসগোল্লা লাভারদের জন্য আছে বেকড রসগোল্লা। সুতরাং মনে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখে রেডি হয়ে যান ভুরিভোজের জন্য।

এতক্ষণ বড়সড় পেটপুজোর কথা বললাম। তবে ছোটখাটো খিদের জন্যও গড়িয়াহাট চত্বরে আছে অনেক ঠিকানা। ফ্লাইওভারের নীচে জিভেজল ফুচকা থেকে শুরু করে 'বেদুইন রোল সেন্টার'-এর এগরোল, 'sankars fry'-এর ফিশফিঙ্গার থেকে 'k2'- এর চিজ চিকেন রোল জাস্ট ফাটাফাটি। তবে বসে আরাম করে চটপটা খেতে চাইলে চলে যান বালিগঞ্জের 'চটরপটর'-এ। আয়েস করে খেতে পারেন খাটটা-মিঠা গপাগপ ফুচকা কিংবা তন্দুরি চাটিজা উইথ অরেঞ্জ ডিলাইট। একবার খেলে নিঃসন্দেহে ফ্যান হয়ে যাবেন। বালিগঞ্জের 'বেদুইন শের-ই-বাংলা'— শুধু নামে নয় গুণমানেও রেস্টুরেন্টের তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে। বেদুইন স্পেশাল ফ্রাইড রাইস সঙ্গে স্পেশাল চিকেন লাবাবদার মশালা স্বাদের বিচারে অনবদ্য। আমি অন্তত চোখবুজে রেকমেন্ড করব। যাঁরা মিষ্টির পোকা তাঁদের বলব বালিগঞ্জ ফাঁড়ির 'বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক'-এর দোকানের সন্দেশ না খেয়ে ফিরবেন না। এছাড়া গোলপার্কে 'গাঙ্গুরাম'-এর রসমালাই আর আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের 'মিঠাই'-এর মিষ্টি দই, আহা মন ভরে যাবেই। তাহলে আর কী, শুভ মহরত দেখে একবার না হয় ঘুরে আসুন গড়িয়াহাট চত্বর। রসেবশে দিওয়ানা হওয়ার পর বাকিটা না হয় আপনিই বলবেন...

বেতারনাটক ও তার ইতিহাস

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-১৫

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ, অখণ্ড অবসর। তখনও আমার বাড়িতে রেডিও ছিল। অনুরোধের আসরের সঙ্গে ঠাকুমার বাধাধরা ছিল রেডিওনাটক। আমিও শুনি। চৈত্রমাস তখনও শেষ হয়নি। এক শুক্রবারের রাতের নাটক ছিল 'তাহার নামটি রঞ্জনা'। অভিনয়ে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র। বেতার নাট্যরূপ বিধায়ক ভট্টাচার্য। ভাই-বোনের সম্পর্কের এক অসাধারণ নাটক। কী সাবলীল অভিনয়! মৃত্যু পথযাত্রী ভাই, বোনের কাছে ধরা দিয়েও দিলেন না। শুনতে শুনতে শ্রোতারা বুঝে নিলেন কৌশিক গুপ্তই আসলে অম্বুজাক্ষ মজুমদার। আজ প্রায় আঠেরো বছর পেরিয়ে গেছে সেই নাটক শোনার। সেদিন বাইরে ছিল নব বসন্তের মৃদু হাওয়া, আর আজ যখন সেই নাটক নিয়ে লিখতে বসেছি, তখন বৃষ্টির ছাট আর উতল হাওয়া। আজও সেই অভিনয় একই রকম রোমাঞ্চ জাগায় আমার মনে।

নাট্য প্রযোজক অজিত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এই নাটকের নেপথ্য ইতিহাস জানা যায়। আকাশবাণীর প্রোগাম এগজিকিউটিভ অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অজিতবাবুকে বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটি নতুন বেতার নাটক লিখিয়ে আনার দায়িত্ব দেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য থাকতেন বিশ্বরূপা

বিকাশ রায়

থিয়েটারের পেছনে, আর অজিতবাবুর বাড়ি ফেরার পথ ছিল ওইটাই। একদিন, দুদিন, তিনদিন— অজিতবাবু যান, বিধায়কবাবু কোনওদিন এক পাতা, কোনওদিন দুপাতা, এমনকী আধপাতাও লিখে দিয়েছেন। এইভাবে প্রায় দু'মাস সময় নিয়ে 'তাহার নামটি রঞ্জনা' এই নাটক সম্পূর্ণ করে অজিতবাবুর হাতে তুলে দেন তিনি। অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় সে নাটক আজও আকাশবাণীতে সংরক্ষিত রয়েছে। শম্ভু মিত্রের কথা যখন উঠল তখন তাঁকে নিয়ে আরও কিছু তথ্য দিই। আমরা জানি তিনি কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন। তিনি মঞ্চতেও সফল, আবার বেতার নাটকেও সফল।

মঞ্চের পাশাপাশি বেতারেও তিনি অনেক নাটকে অংশ নিয়েছেন। মঞ্চে যেমন প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙেছেন, তেমনই বেতার নাটকের অভিনয়েও শ্রোতাদের নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সবসময়। লোকনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'কাক' নাটকে ছিল তিনটি চরিত্র। গ্রাম্য নিরক্ষর চাষি, সেই চাষির এক অবৈধ স্ত্রী বা স্ত্রীর মতো একজন এবং আরেকটি রোম্যান্টিক, আশাবাদী চরিত্র যাঁর সংলাপে কাব্য রয়েছে। নাট্যপ্রযোজক সেই কাব্যিক সংলাপের চরিত্রে শম্ভু মিত্রকে ভাবলেও, স্ক্রিপ্ট পড়ে শম্ভু মিত্র চাষির চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি বলেন, '...এই চরিত্রে অভিনয় করলে শ্রোতারা আমার কাছ থেকে আলাদা কিছু পাবেন না'। 'বিরাজ বউ', 'বিদেহী' (ইবসনের দ্য ঘোস্ট), 'ঘাতক', 'পথের ঠিকানা', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'— এমনই আরও অনেক নাটকেই তাঁকে পাওয়া গেছে। পাশাপাশি বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'ডাকঘর', 'দশচক্র', 'রাজা অয়দিপাউস' প্রভৃতি নাটকেও শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তৃপ্তি মিত্রকেও শ্রোতারা পেয়েছেন।

নাট্য জগতের আরেক কিংবদন্তি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেতার নাটকের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। বলা ভালো তিনি অনেক নাট্য প্রযোজকের মুশকিলআশান ছিলেন। অজিত মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখছেন, তৃপ্তি মিত্রের নাটক 'প্রহর শেষে' ছিল পঁচাত্তর মিনিটের নাটক। রেকর্ডিং-এর সময় দেখা গেল সেই নির্ধারিত সময়ও পেড়িয়ে যাচ্ছে। তখন অজিতেশবাবু দুটি কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে বাদ দিয়ে এবং কয়েকটি চরিত্রের সংলাপে সামান্য বদল ঘটিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা করেছিলেন। শুধু সঠিক এডিটিং নয়, অভিনয়েও তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার। 'মমি', 'নব দূর্বাদল শ্যাম', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয় ছিল অসাধারণ। অজিতেশের

শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র

কথা বলতে গেলে সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অজিতেশবাবু সত্যজিৎবাবুর বেশ কয়েকটি গল্পের বেতার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তিনি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটির বেতাররূপ দিয়েছিলেন। সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে অনুমতি নিতে গেলে তিনি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন শোনেন, নাট্যরূপ দেবেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন একটু থমকে গিয়ে বলেন, 'লেখার পর আমাকে দেখিয়ে যেও'। পরবর্তীতে সেই নাট্যরূপ শুনে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়কে (ছবিতে ছবি বিশ্বাসের চরিত্রটি নাটকে বিকাশ রায় করেছিলেন) টেলিফোনে জানান, যে তাঁর নাটকটি ভালো লেগেছে। আরও একটি সত্যজিৎ কাহিনি 'আংটি ও আধুলির খেলা' অজিতেশবাবু বেতাররূপ দিয়েছিলেন। এই কাহিনিটি নিয়েও সত্যজিৎবাবুর মন্তব্য ছিল 'এখানে হাওড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেলসেটশনের ছবি বর্ণনা করা হয়েছে। ...এটা কী করে উপস্থিত করা সম্ভব?' কিন্তু সেই নাটকও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ে শ্রোতাদের থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। প্রোগাম এগজিকিউটিভ সুনীল সাহা হাওড়া থেকে বর্ধমান বিভিন্ন রেল স্টেশনের আবহ রেকর্ড এনে দিয়েছিলেন। অবশ্য সত্যজিৎবাবুর প্রতিক্রিয়া কিছু জানা যায়নি।

এরপর সাতের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ফেসবুক-ই-মেলের চাপে হারিয়ে গেছে চিঠির গন্ধ

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠি মানে খাম, পোস্টকার্ড, পোস্ট অফিস লেটার বক্স, চিঠি মানে হাতে বল্লম আর পিঠে চিঠির ব্যাগ নিয়ে ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজিয়ে রানারের ছুটে চলা। এই অনুষঙ্গগুলো অনিবার্যভাবে চলে আসে। চিঠি মানে অপেক্ষাতেও থাকা। আগে হয়তো অনেকেই অপেক্ষায় থাকতেন, সেই অপেক্ষার মধুর সমাপনও হতো অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু আজ বিকেলের ডাকে কারও চিঠি আসবে সেই আশায় এখন কতজন থাকেন বলা মুশকিল। চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠি পাওয়া আজকের ফোর-জি মোবাইল বা হাইস্পিড ইন্টারনেটের যুগে আর মানুষের জীবনে সেভাবে নেই, অন্তত ব্যক্তিগত স্তরে। ডাক, ডাকঘর, ডাকবাক্স, ডাকপিয়ন প্রভৃতি শব্দগুলো আস্তে আস্তে যেন অনেক আড়ালে চলে গেছে দৈনন্দিন জীবন থেকে। দুপুর বা বিকেলের ডাকের অপেক্ষায় থাকা যুবক-যুবতীরা সাইকেলের ঘণ্টি শুনেই বুঝে যাবে যে পিওনকাকু এসে গেছে, হাতে এখনই ধরিয়ে দিয়ে যাবে প্রতীক্ষার নীল খাম, সে দিন এখন প্রায় চলে গেছে। কলকাতা তার আয়তন বাড়াতে বাড়াতে পিন কোড ৭০০১৫৬ পর্যন্ত চলে গেলেও, হাতে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি কোনও পোস্ট অফিসেই এখন আর উপচে পড়ে না। অবশ্য শুধু কলকাতাই নয়, চিত্রটা প্রায় একই সারা দেশে, এমনকী গোটা বিশ্বে।

অথচ এই চিঠি ব্যাপারটা মানুষের জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তা পাওয়া বা না-পাওয়ার উপরে একসময় নির্ভর করত অনেক কিছু, এবং তা মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মসূচিকেও নিয়ন্ত্রণ করত। কারণ সেটিই তো ছিল বার্তা আদান-প্রদানের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। প্রত্যাশা আর ভরসার শেষে হাতে লেখা সেই বার্তা যেন অনেকটা অবলম্বন হয়েই হাজির হতো।

চিঠি যেন জীবনের এক-একটি অধ্যায়ের এক-একটা পাতা। কতরকম বর্ণনা, অভিযোগ, অনুরোধ আর অনুরাগ মাখানো ভাষায় নিজের মনের ভাবকে যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে তবে পাঠানো। রাগ, অভিমান, হৃদয়ের উত্তাপ ও ভালোবাসাকে অনুভব করা যায় একমাত্র হাতে লেখা চিঠিতেই। সেই লেখায় যে লিখছে তার যেমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, মনের ভার লাঘব হচ্ছে, তেমনি যার কাছে চিঠি পৌঁছচ্ছে বা প্রাপক যখন চিঠিটি পড়ছে তখন তার কাছেও অনেকগুলো বন্ধ দরজা-জানালা খুলে যাচ্ছে। দূরত্ব অতিক্রম করে কাছে এসে যাচ্ছে প্রিয়জনের শব্দ, গন্ধ স্পর্শ সব। এই গন্ধ আর স্পর্শের ব্যাপারটাও চিঠির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কাগজ আর কলমের যুগলবন্দিতে যে ভাষাচিত্র ফুটে ওঠে চিঠিতে তা তো নিমেষে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়ই, হাতের লেখাটি স্পর্শ করে প্রেরকের হাতের স্পর্শও অনুভব করতে পারে অনেকেই। সঙ্গে তার উপস্থিতির গন্ধ। আক্ষরিক অর্থেই কেউ কেউ চিঠি শুঁকে দেখতেও দ্বিধা করতেন না। রোম্যান্টিক মনের অনেকে আবার চিঠির মধ্যে কিছু সুগন্ধিও মাখিয়ে প্রিয়জনকে পাঠাতেন, যা সেটিকে অন্য সব চিঠি থেকে আলাদা করে তুলত। যুগ যুগ ধরে মানুষ এরকম চিঠির আদান-প্রদান করেছে, অপেক্ষা করেছে, ডাকপিয়নের পথ চেয়ে বসে থেকেছে। সে চিঠির বিষয় কখনও ভালো খবর, কখনও খারাপ খবর, সেটা আবার কখন কখনও পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে পাড়া প্রতিবেশি বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা শহরের খবর বয়ে এনেছে। চিঠি পেয়ে মানুষ কখনও দুঃখে বিমর্ষ হয়েছে কখনও-বা আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। আসলে জীবনের সবকিছুরই প্রসঙ্গ উঠে আসত চিঠিতে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের সুতো হয়ে নীরবে কাজ করে গেছে হাতে লেখা চিঠি।

চিঠির ইতিহাস বেশ প্রাচীন, লিখিত ভাষার ইতিহাসের সমান। ভাষা যখন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকেই চিঠি লেখাও শুরু হয়েছে। ইতিহাস বলে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতসহ মিশর, সুমের, রোম, গ্রিস ও চিন প্রভৃতি দেশে চিঠি লেখার প্রচলন ছিল। শুধু বার্তা প্রেরণই নয়, মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্যও চিঠিও লেখা হতো। তখন তো কাগজের ব্যবহার ছিলনা, চিঠি লেখা হতো ভাঙা আসবাবের টুকরো, ধাতু, পশুর চামড়া, প্যাপিরাস ইত্যাদির উপর। পরবর্তীকালে অবশ্য কাগজ ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় চিঠি লেখা অনেক সহজ হয়ে যায়। চিঠি লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সময়ে পাথরে বা গুহার দেওয়ালে খোদাই করা অনেক প্রাচীন চিঠি আবিষ্কার করেছেন। সে যুগের রাজা বাদশারাও সংবাদ আদান প্রদান করতেন চিঠির মাধ্যমেই।

একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে চিঠির আদান-প্রদানের ব্যাপারটা শুরু হয় অনেক পরে। ১৮৪০ সালে পোস্ট অফিস (ডাকঘর) ব্যবস্থা শুরু হয়। ভারতে প্রথম পোস্ট অফিস স্থাপিত হয় বোম্বেতে (মুম্বই) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। আর বিশ্বে ডাকটিকিট প্রথা প্রথম শুরু হয় গ্রেট ব্রিটেনে। ভারতে প্রথম তা শুরু হয় ১৮৫২ সালে। ক্রমশ বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই ব্যবস্থা। প্রথম অল ইন্ডিয়া স্ট্যাম্প প্রবর্তন হয় ১ অক্টোবর ১৮৫৪ সালে। ১৮৬৮ সালে কলকাতায় তৈরি হয় জিপিও যা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য ডাকঘর হয়ে ওঠে। ১৮৬৯ সালে প্রচলন হয় পোস্টকার্ডের। ১৯১১ সাল থেকে প্রচলিত হয় এয়ার মেইল যার ফলে বিদেশেও সহজে চিঠি পৌঁছনো সম্ভব হতে লাগল।

তবে চিঠি মানে শুধু পারিবারিক কিছু খবরের আদান-প্রদান বা মনের কথা প্রকাশ করে প্রিয়জনকে পাঠানো তাই-ই নয়, এর থেকেও অনেক বেশি কিছু। যেমন বিষয়বস্তু অনুযায়ী চিঠির ভাষা স্বাভাবিকভাবেই এক-এক রকম। শব্দবন্ধ ও বাক্যের মেলবন্ধনে যে ভাষা তৈরি হচ্ছে চিঠি লেখার বেলায়, তা অনেক সময়েই সৃষ্টিশীলতার পর্যায়ে চলে যায়। শুধু দরকারি কথা জানানোর বেলায় যে ভাষায় চিঠি লেখা হয়, তা পাঠককে কোন একটা বিষয়ে অবগত করতে পারে, আর তার বাইরে যেসব চিঠিপত্র মনের বিশেষ অবস্থার ভাবনাকে প্রকাশ করে বা আবেগের তাড়নায় লেখা, সেখানে ভাষা হয়ে ওঠে সৃষ্টিশীল। অনেক সময় তা চলে যায় সাহিত্যের পর্যায়ে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পত্রসাহিত্য যার আকর্ষণ পাঠকের কাছে অপরিসীম। মহান কিছু ব্যক্তিত্বের হাতে লেখা চিঠিপত্রের সংকলন এভাবেই পত্রসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে অমলিন হয়ে আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি। হৃদয়ের কথা এমন উজাড় করে লিখতে পারা চিঠির মাধ্যমেই সম্ভব। চিঠিপত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইন্দিরা দেবীর কাছে লিখেছিলেন, 'আমিও জানি তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সব বিচিত্র ভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে, এমন আর কোনও লেখায় হয়নি।'

চিঠি লেখার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কাগজ। শুধু কাগজ দেখেই বোঝা যেত যিনি চিঠি লিখেছেন তাঁর যত্ন আর ভালোবাসা কতটা গভীর।

পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার ডাকঘর নির্দিষ্ট কাগজেই লিখতে হয়, কিন্তু খামের মধ্যে কাগজে লিখে যে চিঠি পাঠানো হতো সেই কাগজের আকার আকৃতি, রং ও গুণমান চিঠিতে লেখা বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু অলিখিত বক্তব্য পৌঁছে দিত প্রাপকের কাছে। এই অভিনবত্ব শুধু কাগজে লেখা চিঠির ক্ষেত্রেই সম্ভব।

আর হাতের লেখা? সে-ও আর একরকম ব্যঞ্জনার প্রকাশ। সুন্দর হাতের লেখা বা যত্ন নিয়ে ধরে ধরে লেখা আর বিরক্ত হয়ে বা তাড়াহুড়োর মধ্যে যেমন-তেমন করে কিছু লিখে চিঠি পাঠানো, প্রাপক ঠিক বুঝে নিতে পারে প্রেরকের মনোভাব। তাছাড়াও চিঠি লেখার জন্য যেহেতু কাগজ-কলম ছাড়া আর কোনও যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সাহায্য লাগে না, তাই লিখতে বসে শুধু লেখার দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগটুকু থাকে। এই বোধটাও চিঠি পড়ার সময় প্রাপককে ছুঁয়ে যায়, সেও যে গুরুত্বপূর্ণ কেউ, এই স্বীকৃতিটুকু তার অজান্তেই তাকে একটা তৃপ্তি এনে দেয়। আসলে চিঠি শুধু চিঠি নয়, আর তার মজাটা এখানেই। হাতেলেখা চিঠির এটাই স্বকীয়তা।

এই স্বকীয়তাকে মাধ্যম করে গড়ে উঠেছিল কত পত্রমিতালি। দেখা নেই, শোনা নেই, শুধু পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠত বন্ধুত্ব, কখন কখনও তা ঘনিষ্ঠতার পর্যায়েও পৌঁছে যেত। কলকাতা তো বটেই, পত্রমিতালির মাধ্যমে বন্ধুত্ব করার জন্য কলকাতার বাইরেও কিছু ঠিকানা লক্ষ করা যেত। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে পত্রমিতালি বিষয়টি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল।

অবধারিতভাবে আর একটি চরিত্র চিঠিপত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, ডাকপিয়ন। কতরকমের খবর নিয়ে তার চলাফেরা। কতজনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তার নিজের মনেও

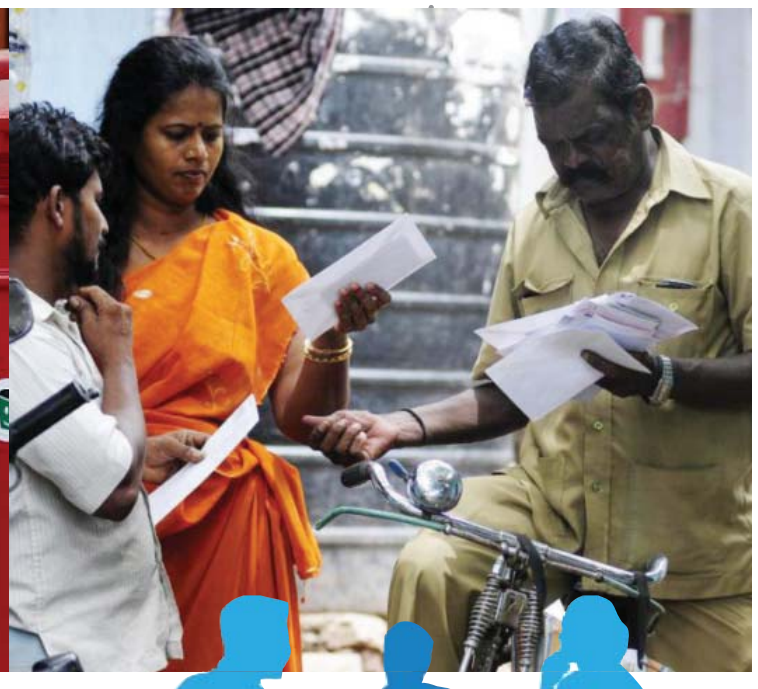

এরপর চারের পাতায়

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

গভীর অসুখ

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

কলকাতা নিয়ে লিখতে লিখতে যেন কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর হয়ে উঠল আরও। এতদিন যা ছিল খুব স্বাভাবিক রোজকার জীবন। এই কলাম লিখতে লিখতে সেই রোজকার জীবনের মধ্যে যেন চকিতে অনেক ভুলে যাওয়া জিনিস চোখের সামনে চলে এল।

কলকাতা ছিল আমার অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে। তাকে নিয়ে এতদিন কিছু যেন আলাদা করে ভাবিনি।

কিন্তু নিজের থেকে আলাদা করে শহরটাকে দেখবার পর শহরটাকে যেন বেড়াতে গিয়ে দেখা দূরের শহর মনে হল। একবার ফ্রান্সে এক ফরাসি তরুণী আমাকে বলেছিলেন তিনি পৃথিবীর আর যেখানেই যান কোনওদিন কলকাতা যাবেন না। কারণ ডোমিনিক লাপিয়েরের 'সিটি অব জয়' পড়ে তিনি জানেন যে কলকাতা হল পৃথিবীর বৃহত্তম কুষ্ঠ রোগীর ডেরা আর একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি এইডস রুগি কলকাতাতেই দেখা যায়।

গল্পের গরুকে গাছে তুলে দিতে সিদ্ধহস্ত ফরাসি কলমচি ডোমিনিক লাপিয়ের আশির দশকের মাঝামাঝি 'সিটি অব জয়' বলে কাহিনিটি লিখেছিলেন। তারপর সেটা ১৯৯২ সালের গোড়ার দিক। ফ্রান্সে বেস্টসসেলার এই বইটি নিয়ে ছবি করতে এলেন তরুণ পরিচালক রোল্যান্ড জফি। জফি কলকাতায় সোনাগাছিসহ বিভিন্ন রেডলাইট এলাকা ঘুরে ঘুরে শ্যুটিং শুরু করলেন।

১৯৯২ সালে মানুষের জীবনে এত তথ্য ছিল না। পৃথিবী জুড়ে সাবলীল তথ্যযুগ তখনও শুরু হয়নি। তখন মানুষ খবর জানত কাগজ পড়ে। টিভিতে দিনে আধঘণ্টার খবর দেখানো হতো শুধু। টিভির সেই খবরে প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতির কর্মসূচি ছাড়া আর থাকত বড় ট্রেন দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতন খবর। তাও ক'জন মারা গিয়েছেন, কতজন আহত আর কোথায় কখন দুর্ঘটনাটি হয়েছে এইটুকুর বাইরে আর কোনও কথা বলা হতো না। সেইসময় কলকাতার প্রধান খরবের কাগজগুলোতে 'সিটি অব জয়' নিয়ে বিস্তর লেখালিখি শুরু হল। একটি কাগজে এমন কথাও ছাপা হল যে 'সিটি অব জয়' ছবিটি নাকি 'পথের পাঁচালি'র মতন ভারতের দারিদ্র্যকে ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে। এ ছবি অস্কার পাবে আর বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে নেবে। টালিগঞ্জের কলাকুশরীরা কেউ কেউ ডাকও পেলেন জফির ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে। যাঁরা ডাক পেলেন তাঁদের ওপর যেন সাধারণ কলকাতাবাসীর সমীহ একটু বেড়ে গেল। তখনও বিদেশের যে কোনও বিষয়কে আমরা কলকাতার লোকেরা খুব বড় করে দেখতাম। বিদেশি ছবিতে কাজ করা মানে তখন আমাদের কাছে একটা স্বর্গীয় উচ্চতায় পৌঁছনো। মনে আছে সেই 'সিটি অব জয়'-এ অভিনয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন একজন অভিনেত্রী। তাঁকে নিয়ে কলকাতার

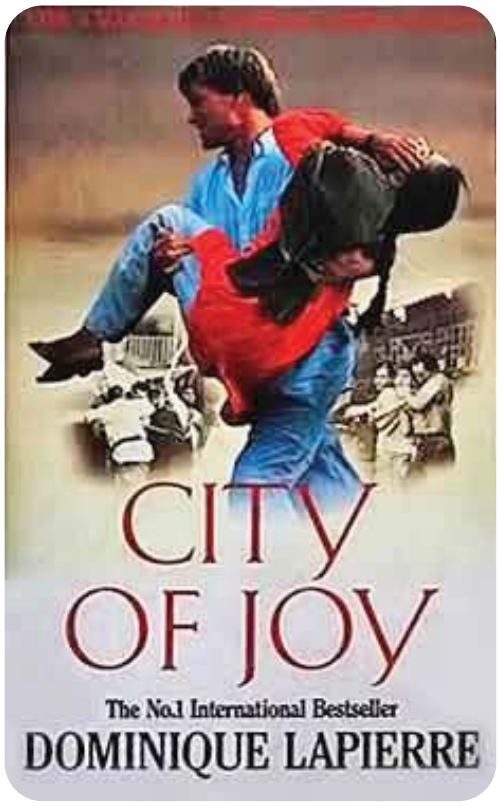

সবকটা বাংলা আর ইংরেজি কাগজের প্রথম পাতায় দারুণ শোরগোল পড়ে গেল। সেই অভিনেত্রী সাক্ষাৎকারে বললেন অনর্থক অকারণ যৌনতা রয়েছে ছবিটির চিত্রনাট্যে। সেইজন্য তিনি অভিনয় করবেন না। কিন্তু তাঁর কথা যেন কেউ শুনলামই না আমরা। সাদা চামড়ার মানুষ যে নিচুস্তরের কোনও কাজ করতে পারেন, সেটা আমরা ভাবতেই পারতাম না।

'সিটি অব জয়' কাহিনিতে যেহেতু এইডস রোগের একটা বড়রকমের ভূমিকা আছে তাই নব্বই দশকের গোড়া থেকে শহরে এইডস নিয়ে কথাবার্তা খুব বেড়ে গেল। দু-এক বছরে ১৯৯৩-'৯৪ সাল নাগাদ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কলেজ-ইউনিভার্সিটির যুবক-যুবতীরা চুমু খেতেও ভয় পেতে শুরু করলেন। বিয়ের আগে এইডস আছে কিনা পরীক্ষা করবার হিড়িক পড়ে গেল। শহরের জ্যাঠামশাই-রা সামাজিক অনুশাসন চাপানোর এত মোক্ষম সুযোগ দুশো-তিনশো বছর আগেও হাতে পাননি। একটি নিরাপদ বিয়ে এবং নিরাপদ যৌনতার বাণীতে শহর ছেয়ে গেল। কিশোর-কিশোরীরা হাত ধরাধরি করে হাঁটলে প্রেমহীন শহর ফুঁসে উঠে বলল— বিয়ের আগে নয়...! এইডস হবে তোদের। এইডস আতঙ্কে শহুরে মধ্যবিত্ত মনন জেরবার হয়ে পড়ল যেন। নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করল শহরের পোস্টারে, বাজারে, অচেনা ড্রয়িংরুমে। যেমন চুমু খেলে কি এইডস হয়? কী করে চেনা যাবে এইডস রুগি? আর যে বিদেশ বিমুগ্ধতার হাত ধরে 'সিটি অব জয়'-এর চর্চায় কলকাতার মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমে এইচআইভি-র জীবাণু ঢুকেছিল সেই বিদেশ নিয়েই শহরকে সন্দেহে ফেলে দিল এইডস বলে অসুখটি। কলকাতা বিদেশি সাহেব-মেম দেখলে তখন ভাবত এইডস নেই তো। সাহেব মেমরা যে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের ঘেরাটোপ প্রায় মানেই না সে আর কে না জানে? ফলে ওদের সাক্ষাৎ এইডস রুগি হওয়া তখন আটকায় কে?

শরীর মনের স্বাধীনতার গলা টিপে মারবার জন্যে এইডস রোগটির কোনও বিকল্প পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল।

কলকাতার যে-সব সেলিব্রিটির রঙিন প্রেমজীবন ছিল তাঁদের নিয়ে তখন শহরের চেনা অলিন্দগুলো ফিসফিস করে বলত এদের তো এইডস হবেই। এদের কাছে গেলে আমাদেরও হবে।

সিটি অব জয় নিয়ে হুড়োহুড়ির বছর দশেকের মধ্যে জন্ম হল বুলাদির। কলকাতার জনতা তোমরা একটি মাত্র বিয়ে ছাড়া কিচ্ছুটি যদি ভাবো বুলাদি তোমাদের দরজায় কড়া নাড়বেনই নাড়বেন।

বৃষ্টিতে ভিজছো প্রেমিক-প্রেমিকা একসঙ্গে— সাবধান ওই যে বুলাদি।

কাউকে চিঠি লিখছ কি যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি? একবার তবুও ভেবে দেখো চিঠি এইচআইভি-র বাহক হতে পারে কিনা? বুলাদি এ-বিষয়ে কী বলছেন একবার শুনে নিও মন দিয়ে। আর তুমি যদি বিয়ে করা বর বউ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে বেশিদূর গড়াও তাহলে তো তুমি সাক্ষাৎ দুশ্চরিত্র। তাহলে তোমার একমাত্র ওষুধ এইডসে মৃত্যু। বুলাদির অসীম বাণীতে আমার শহর যেন ভালোমন্দ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব মাপতে বসল একটা অসুখের নিক্তিতে। তাও আবার সেই অসুখ এমনি যা শহরের খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা গিয়েছে।

আসলে স্বাধীন চিন্তার ওপর চিরকালের একটা রাগ এইডসের রূপ ধারণ করে শহরের রাস্তাঘাট ছেয়ে দিল। মহানগরের আশি শতাংশ মানুষের মনে ঢুকে পড়ল এইচআইভি ভাইরাস।

এভাবে বেশ কিছুদিন এই শহর বুলাদির বাণীকে ধর্মগুরুর বাণী মনে করে প্রণাম করল। তারপর হু হু করে ঢুকে এল নেট, আইফোন, গুগল, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ। পৃথিবীটা বদলে গেল। ঘরে বসে সব হাতের মুঠোয়, ঘুচে গেল দেশ কাল-সীমানার গণ্ডি... শহরটা ছেয়ে যেতে লাগল নতুন নতুন তথ্যে। হাতের মুঠোয় এসে গেল সব তথ্যের সম্ভার। আর বুলাদির কোনও দরকার রইল না শহরে। শহরের হোর্ডিং থেকে, মন থেকে মুছে গেল বুলাদির নামটা। এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাবও শহরের বসন্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

ফেসবুক-ইমেলের চাপে হারিয়ে গেছে চিঠির গন্ধ

তিনের পাতার পর

যেন তৃপ্তি নেমে আসে। কখন যেন সেও মানুষের আপনজন হয়ে ওঠে। তাই তাকে নিয়েও সিনেমা তৈরি হয় এবং সে ছবি দর্শকদের ভালো লাগে।

কিন্তু সে-সবের দিন গেছে। চিঠিপত্রের পিছু পিছু এসেছিল টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, তারও পরে ইন্টারনেট, ই-মেল। কিছুদিনের জন্য ছিল পেজার। সেটি শুধু সংক্ষিপ্ত মেসেজ পাঠানোর জন্য। কলকাতা অবশ্য পেজারকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসে গেল বিপ্লব। কলকাতাসহ শহরতলি ও সারা দেশ ছেয়ে গেল টেলেফোন বুথে। যে কোনও বুথ থেকে দেশের যে কোনও জায়গায় ফোন করার সুবিধা পেল সাধারণ মানুষ কিছু মূল্যের বিনিময়ে। তারপর ১৯৯৫-এর ৩১ জুলাই ভারতে চালু হল মোবাইল পরিষেবা। কলকাতা থেকে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মোবাইলে প্রথম কলটি করেন দিল্লিতে, তখনকার টেলিকম মন্ত্রী সুখরামকে। সূচনা হল এক নতুন যুগের। পুরো একটি টেলিফোন তাও হাতের মুঠোয় বা পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে খুশি, ফোনে কথা বলার জন্য আর বাড়ির বা অফিসের ল্যান্ডফোনের কাছে এসে বসতে হবে না, মোবাইল থেকেই কথা বলা যাবে যে কোনও জায়গা থেকেই। এই বিস্ময় আর আনন্দ অভিভূত করল কলকাতাকে তথা সারা দেশকে। তাতে আবার ই-মেলে এবং ছোট করে সংবাদ বা এসএমএস পাঠানোরও সুবিধা আছে। আর কে চিঠি লেখে? আস্তে আস্তে কলকাতাকে দখল করতে শুরু করল মোবাইল।

সংক্ষেপে দ্রুত খবর পাঠানোর জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে ভারতে ১৬৩ বছর ধরে টিকে ছিল টেলিগ্রাম ব্যবস্থা। ডিজিটাল দুনিয়ায় ব্রাত্য হয়ে সেও বন্ধ হয়ে গেল ১৪ জুলাই ২০১৩ থেকে। টেলেক্সও আর নেই। ফ্যাক্সব্যবস্থা অবশ্য টিকে আছে তার অভিনবত্বের জন্য। সই করা চিঠিও হুবহু ছবির মতো টেলেফোন যোগাযোগের মাধ্যমে অপর প্রান্তে পাঠানো যায় অতি দ্রুত। যদিও বেশিরভাগই বিভিন্ন অফিসের চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্যই ফ্যাক্স-এর ব্যবহার হয়।

এখন চিঠি লেখার হাত টেনে ধরেছে মোবাইল। স্মার্টফোনের সাহায্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেসেজ পাঠানোর অদ্ভুত আরাম। কষ্ট করে কে আর চিঠি লেখে? তাই কমে গেছে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। শুধু অভিজ্ঞতাই নয়, পরিসংখ্যানও বলে সে কথা। শুধু পোস্টকার্ডের মাধ্যমে পাঠানো চিঠিই ২০০৩-'০৪ থেকে ২০১৩-'১৪ এই এক দশকের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। আর পোস্টকার্ডসহ অন্যান্য চিঠিপত্র ও পার্সেলের মিলিত সংখ্যা ওই দশকেই ৮.৭২ কোটি থেকে কমে হয়েছে ৬.০৫ কোটি অর্থাৎ কমেছে ৩০ শতাংশেরও বেশি।

লিখিত চিঠির শেষ উত্তরাধিকার এখন ই-মেল। ১৯৭১ সালে রোমান্ড স্যামুয়েল টমলিসন নামে আমেরিকার একজন প্রোগ্রামার যেদিন ই-মেলের সূচনা করেন, তারপর থেকেই ক্রমশ চিঠিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন ঠিকানা মানে ই-মেল আইডি। অপেক্ষার আগেই পৌঁছে যাওয়ার মতো দ্রুতগামী। তবে চিঠির মতো যাবতীয় ভাব প্রকাশ করা গেলেও ই-মেলের কোনও স্বকীয়তা নেই, হাতে লেখা চিঠির মতো রোমাঞ্চ নেই। আরও অনেক কিছু নেই। হাতের গন্ধ নেই, মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো কাগজ নেই, নেই ডাকপিয়নের নস্টালজিয়া।

বরং আছে উৎকণ্ঠা। সে সময় পরিবারের কোনও সদস্য বা বন্ধু বা আত্মীয়-পরিজন কেউ চলে যাবার সময় বলা হতো পৌঁছে যেন চিঠি দেয়। পৌঁছনো সংবাদের সে চিঠি সাধারণ ডাকে এসে পৌঁছাতে অনেক দিন লেগে যেত। সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন চিঠি দিতে কেউ বলে না। ট্রেনে-বাসে জার্নির সময়টুকুতেই অনেকবার ফোন করে খবর দিতে হয়, না হলে উদ্বিগ্ন হতে হয়। কেউ কাউকে বলে দিল 'পৌঁছে একটা পিং করে দিও' বা 'পৌঁছে একটা টেক্সট করে দিও' এই হল মডার্ন ফরম্যাট। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপের মতো স্যোশ্যাল মিডিয়াগুলো চিঠির জায়গাটাকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে।

সেই সময়ে আর একটা অদ্ভুত মজা ছিল চিঠি লেখার ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জন বা আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চিঠি না পাওয়ার অনুযোগ আসতই। তখন একটু নির্দোষ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যেত, চিঠি তো অবশ্যই দেওয়া হয়েছে, হয়তো কোনও কারণে এসে পৌঁছয়নি। পোস্ট অফিসের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সে যাত্রা কিছুটা রেহাই পাওয়া যেত। আর এই চিঠি পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে রোম্যান্টিক বাংলা ছবি তো এখনও অমলিন হয়ে আছে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

দর্জিপাড়ার মিত্রবাড়ির পুজো পরিচালনা করেন বাড়ির মেয়েরাই

বিপাশা চক্রবর্তী

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম দর্জিপাড়ার মিত্রবাড়ির পুজো। আভিজাত্য, শিল্পনৈপুণ্য, রীতি-নীতি সমস্ত দিক দিয়েই এই বাড়ির পুজোর আকর্ষণ সকলের কাছে একটি অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। মহিলা পরিচালিত এই পুজো আর পাঁচটি বনেদি বাড়ির থেকে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। এক আলাপচারিতায় দর্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রের পরিবারের কন্যা অনসুয়া বিশ্বাস আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এই বাড়ির পুজোর ঐতিহ্য। পুজো এবার ২১১ বছরে পদার্পণ করল। অনসুয়া দেবীর কথায়, পুজো মহিলা পরিচালিত হলেও বাড়ির ছোট থেকে বড় সকল সদস্যই সমান উৎসাহে পুজোর সমস্ত কাজ করে।

অনেক বছর আগে এই বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ মিত্র। সেই সময় ঠাকুরদালানে এই পুজো হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণ মিত্র-র পরে তাঁর অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে এই পুজোর দায়িত্ব নেন তাঁর মধ্যমপুত্র রাজকৃষ্ণ মিত্র। তারপর তাঁর এক ছেলে অমরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র পুজোর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র যিনি অমরেন্দ্র মিত্র-র ছেলে ও অনসুয়াদেবীর দাদু হাতে পুজো পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়। এরপর মানবেন্দ্রকৃষ্ণবাবুর পরিবারের লোকেরাই এই পুজোর দায়িত্ব বংশপরম্পরায় সামলে আসছেন। তাঁর তিন ছেলেদের বর্তমানে কেউ আর জীবিত নেই। পাশাপাশি তাঁর ছেলেদের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় এই পরিবারের মেয়েরাই পুজো পরিচালনা করে থাকেন।

এই পুজো কোনও ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। পরিবারের সদস্য যা আয় করেন তার থেকে সারা বছর টাকা জমিয়ে সকলে মিলে এই পুজোর আয়োজন করেন। কাজেই পুজোয় কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, পুজো এই পরিবারে সকল সদস্যদের কাছে শুধুই মা আসার আনন্দ।

এ-বাড়ির পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই। সরস্বতী পুজোর সময় যখন নতুন ডাল ওঠে, সেই ডাল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বড়ি বানানো হয়। যেমন কলাইয়ের ডালের বড়ি, ভাজা বড়ি, ঝোলের বড়ি, পালং শাকের বড়ি, বিট পালং-এর বড়ি, চিনেবাদামের বড়ি, ধোকার বড়ি, আরও একাধিক ধরনের বড়ি তৈরি হয়। পুজোর সময়ে প্রথমে সেগুলি মা দুর্গাকে নিবেদন করা হয়, তারপরে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি নানা ধরনের আচারও তৈরি হয়। যেমন— কুলের আচার, আমের আচার, তেঁতুলের আচার সেগুলিও তৈরির পর মাকে প্রথমে নিবেদন করা হয়। তবে এই সমস্ত কিছুই হয় সোলারে অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে তৈরি করা হয়। পাশাপাশি নারকেলের মিষ্টিও তৈরি করা হয়। প্রায় ৮০০ থেকে হাজার পিস নাড়ু তৈরি হয়। তবে পরিবার কায়স্থ বলে ঠাকুরমশাই নাড়ুতে প্রথম পাক দিয়ে দেওয়ার পরে পরিবারের মেয়ে-বউরা নারু তৈরি করেন। এমনকী পুজোর বাজারও বাড়ির মেয়েরা করেন।

তবে পুজোর সময়ে মায়ের জন্য যে ভোগ তৈরি হয়, তা ঠাকুরমশাইদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির মেয়েরাও ফল, মিষ্টি খান। তবে দশমীর ভোগ সকলেই পান। সেইসঙ্গে সব ধর্মের মানুষ প্রতিমা দর্শনের জন্য মিত্রবাড়িতে আসেন। সাম্প্রদায়িক কোনও বিধিনিষেধ নেই।

পুজোর শুরু বলতে কাঠামো পুজো হয় রথের দিন। এই পরিবারের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিমার মুখ একই রকম রাখার জন্য প্রতিমার মুখের ছাঁচ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। গঠনগত বৈশিষ্ট্য বলতে তেচালা প্রতিমা। এখানে দেখা যাবে 'মঠচৌরি'(মাটির ছাঁচের কাজ। জিনিসটি অনেকটা টেরাকোঠার মতো দেখতে)। প্রতিমার পিছনের দিকের অংশে এই কাজ থাকে। ওই ছাঁচটিও সংরক্ষণ করে রাখা হয়। শিল্পীরা তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের মাধ্যমে খুব পরিশ্রম করে বাড়িতেই এটিকে তৈরি করেন। ডাকের সাজের প্রতিমাকে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত থাকেন পরিবারের সদস্যরাই। দুর্গাপুজোর মতো এত বড় পুজোয় সহযোগিতাই আসল কথা। পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও আন্তরিকতাও মিত্রবাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া প্রতিমার অন্যান্য আকর্ষণীয় দিক বলতে সিংহ এখানে দেবসিংহ। অর্থাৎ ঘোড়ার আদলে মুখের গঠন। দেবসিংহ বলতে সিংহের বিক্রম আর ঘোড়ার ক্ষিপ্রতাকে বোঝানো হয়। মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মুখ দেবী আকৃতির, কিন্তু কার্তিক ঠাকুর ও অসুরের বাংলা মুখ অর্থাৎ মানুষের মুখের আদলে তৈরি করা হয়।

প্রতিমা সাজাতে অংশগ্রহণ করে বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা। একসময় নবদ্বীপ থেকে পটুয়া এসে এই কাজ করতেন, তবে তিনি মারা যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরাই নিজেদের হাতে এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। প্রতিমা গড়ার কাজ করেন মাধুরী শিল্পালয়ের অসিত মুখোপাধ্যায়। চালচিত্র বাড়িতেই তৈরি করা হয়। প্রতিমার গায়ের রং অতসীপুষ্পবর্ণ হলুদ। কলাবউ স্নানও বাড়ির ভিতরে হয়।

নৈবেদ্য মিত্রবাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনসুয়াদেবী কথায়, খিচুরি নৈবেদ্য হয়। মুগের ডালকে রোদে দিয়ে, একটু গাওয়া ঘি মাখিয়ে সেটাকে ভাজা হয়। তারপর নীচে চাল দিয়ে তার ওপর ডাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর তার চারপাশে বিভিন্ন রকমের কাটা সবজি যেমন, আলু, পটল, বেগুন, ফুলকপি ভাজা, আলু-পটলের চচ্চড়ি, আলু-পটলের দম, তার জন্য আদাবাটা, ধনেগুঁড়ো, পাঁপড় দেওয়া হয় অর্থাৎ খিচুরি যা দিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়াও থাকে আচার ও নারকেলের মিষ্টি। এইভাবে মাকে ভোগ নিবেদন করার রীতি চলে আসছে।

পাশাপাশি মাখনের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সেখানে থাকে মিছরি। তবে সেখানেও মাখনকে খুব সুন্দরভাবে শ্রী'র আকারে গড়ে মাকে দেওয়া হয়। মিত্রবাড়ির প্রত্যেকের মধ্যেই পরতে পরতে নান্দনিকতার ছাপ স্পষ্ট— সেই কথা অনসুয়াদেবীর কথা থেকে বোঝা যায়। ফুলের আদলে তৈরি করা হয় পানের নৈবেদ্য। তাছাড়া মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়া হয় মিষ্টির রং মিলিয়ে। সন্ধিপুজোর নৈবেদ্য হয় মোট আট কেজি চালের। তবে রাধাকৃষ্ণ মিত্রের সময়ে বলি প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু পরে রাজকৃষ্ণ মিত্রের আমলে একবার একটি ছাগ শিশু তাঁর পায়ের ওপর এসে আশ্রয় চায়। তারপর থেকে সেই থেকে বলি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে যে পুজোর যেদিন যতগুলো বলি হতো সেই অনুযায়ী চিনির নৈবেদ্য দেওয়া হয় নতুন পিতলের রেকাবিতে। এছাড়া বাড়িতে রাধাগোবিন্দর জন্য লুচি ভোগ তৈরি করা হয়, সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ধরনের ভাজা। ভাজাতে নুন দেওয়া হয় না। গজা-মেঠাইয়ের ভোগ তৈরি করেন ঠাকুরমশাইরা। বাড়িতেই সমস্ত মিঠাই তৈরি হয়।

সন্ধিপুজোর বৈশিষ্ট্য বলতে ১০৮ দীপমালার পাশাপাশি ১০৮ পদ্মফুলের বদলে অপরাজিতা ফুল দেওয়া হয়ে থাকে, এটাই এই বাড়ির রীতি। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিনই কুমারী পুজো হয়। কল্যাণী পুজো হয় অষ্টমীর দিন। বাড়ির আত্মীয়-পরিজন, পাশাপাশি সকলের মঙ্গলকামনা করে এই পুজো করা হয়। পুরো পুজোটাই হয় গৃহদেবতা রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা নারায়ণকে সাক্ষী রেখে।

বিসর্জনের রীতি বলতে বাড়ির ছেলেরাই সিংহাসন থেকে উঠোনে প্রতিমা নামিয়ে আনেন। বরণ করা হয়। তার আগে মুটেরা প্রতিমার গায়ে হাত দিতে পারেন না। সেইসময় পরিবারের ছেলেদের পরনে থাকে ধুতি, হাতে ছড়ি। আগে একটা সময় খালি পায়ে যাওয়ার প্রচলন থাকলেও রাস্তাঘাটের সমস্যার জন্য চটি পরে যাওয়ার চল শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে আগে নিরঞ্জনের সময়ে প্রতিমা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার চল থাকলেও এখন সেই নিয়ম আর নেই। সেই সঙ্গে নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হতো কিন্তু নিয়মকানুনের বেড়াজালে এখন সেটাও বন্ধ।

পুজোর সময়ে একটি অলৌকিক ঘটনা কথা জানালেন মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের নাতবউ শুভ্রা বসু। তাঁর কথায়, মা যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী থাকেন তখন, ঠাকুরদালান ফাঁকা রাখা হয় না। রাতে কেউ না থাকেই ওই জায়গায় থাকেন। মায়ের সামনে মানে সোজা পথে কেউ শুতে পারে না। একবার জমিদারির সময় অনেক গাড়োয়ানরা এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ মাঝখানে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখেন যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে আর তিনি নেই, একপাশে উঠোনের দিকে গড়িয়ে চলে গিয়েছেন। পরে তাঁর মনে হয়েছিল কেউ যেন তাঁকে জোড় করে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে মিত্রবাড়ির পুজো আলাদা ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

১১ সেপ্টেম্বর
দাঁ বাড়ির পুজো
১৮ সেপ্টেম্বর
দর্পনারায়ণ মল্লিক বাড়ির পুজো
২৫ সেপ্টেম্বর
শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

পুরনো কলকাতার বারোয়ারি পুজো

দোয়েল দত্ত

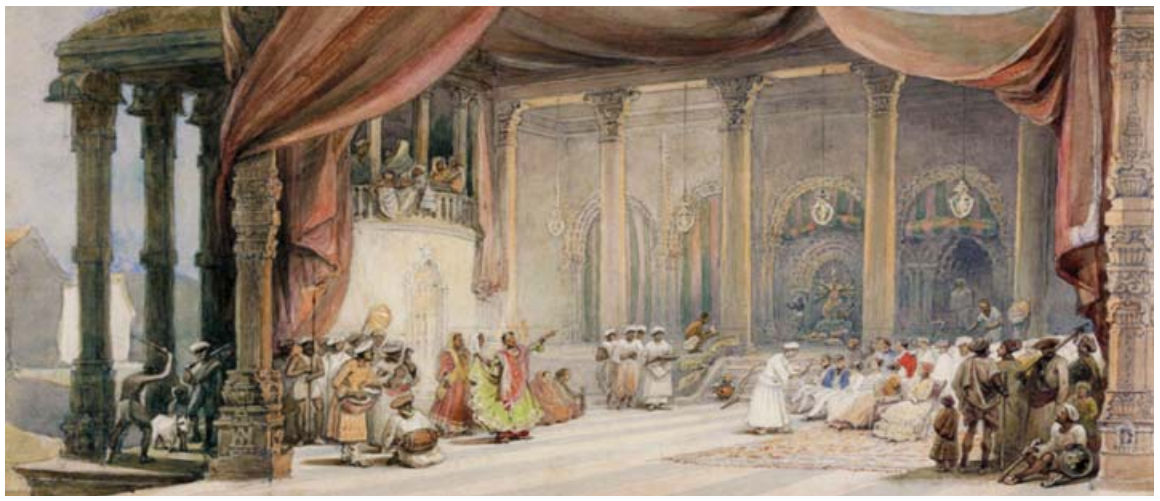

শহর কলকাতার বাবু সংস্কৃতিতে বনেদি পুজোর যতই রমরমা থাকুক না কেন, ইতিহাসের সমর্থিত সূত্র জানাচ্ছে যে, সেগুলো ছিল মূলত ইংরেজদের সঙ্গে বাবুদের সম্পর্কের ভিতটাকে আরও একটু মজবুত করে নেওয়ার প্রয়াসমাত্র। সেখানে সাধারণের প্রবেশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলত সুতানুটি বা কলকাতা ছাড়িয়ে তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মানুষদের মনে দানা বাঁধতে থাকে ক্ষোভ। আর তারই ফলশ্রুতিতে ১৭৯০ সালে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় বারোজন ব্রাহ্মণ বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। ইতিহাস জানাচ্ছে, এটাই প্রথম বাংলার বারোয়ারি পুজো। বারোজন বন্ধু বা ইয়ার মিলে এই পুজো শুরু করার ফলে তার নাম হয় 'বারোয়ারি'। ক্রমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও শুরু হয় বারোয়ারি পুজো। সারা বছর ধরে ব্যবসায়ীরা লাভের টাকা অল্প অল্প করে জমিয়ে সেই টাকায় শুরু হয় পুজো।

তবে অনেকের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখানোর উৎসাহ এতটাই বেশি থাকত যে তখন থেকেই দুর্গাপুজোতে সাধারণের থেকে চাঁদা নেওয়া হয়ে ওঠে একটা অঘোষিত রেওয়াজ। বারোয়ারি পুজোর বিনোদনের দিকটায় একবার নজর ফেরালেই বোঝা যাবে প্রমোদে বাবু-সংস্কৃতিকে টেক্কা দেওয়াই ছিল এদের প্রধান ধ্যানজ্ঞান। আর এই বারোয়ারি পুজোতে বাইনাচ আর খেমটার অস্তিত্বও চোখে পড়ে। ধনীগৃহের সুরার বদলে বারোয়ারি পুজোর দুর্গামণ্ডপের অদূরেই গাঁজার আসর বসিয়ে চলত রঙ্গ-তমাশা। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা থেকে পাওয়া যায়, 'চুরুট, তামাক ও চরসের ধুয়োয় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠল যে... আধঘণ্টা প্রতিমাখানি দেখা যায়নি।' (জনৈক একটি বারোয়ারি পুজোকে নিয়েই এরূপ মন্তব্য)।

আর পাশাপাশি উল্লেখ পাওয়া যায় আখড়াই, সঙ ও যাত্রাব্যবস্থার। হ্যাঁ, এগুলোও বারোয়ারি দুর্গাপুজোর বিনোদনের অংশ ছিল বই কী। সঙের আসরে প্রাধান্য পেত রামায়ণ ও মহাভারতের পালা। এখনকার পুজো নিয়ে এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পুরস্কারের বন্যা, সেসব কিন্তু সেই আমলেও বিদ্যমান ছিল। কেউ পাল্লা দিত প্রতিমার উচ্চতা নিয়ে, তো কোথাও আবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পুজোর জাঁকজমক বাড়ানোর চেষ্টারও কমতি ছিল না। এমনকী বাবুরাও বজরা চেপে বারোয়ারি পুজোর সঙের পালা দেখতে আসতেন।

অষ্টাদশ শতকে বারোয়ারি পুজোকে কেন্দ্র করে সমাজে যে গ্লানি ও অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল, নানা দিক থেকে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন কিছু মানুষ। পাণ্ডাদের অত্যধিক মাদকসেবন করে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মারপিঠ, একে অপরকে অশ্রাব্য গালাগাল, হলাহল পান— কী না হতো সেখানে। শহুরে বাড়াবাড়ির অঙ্গ হিসাবে মদের আসর আর বাইনাচ তো ছিলই।

তবে বারোয়ারি পুজোতে অনেকক্ষেত্রে ধনী বাবুরাও সহায়তা করতেন। স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য অবারিত ছিল তাঁদের দ্বার। এর মধ্যে তৎকালীন শহরের রাজা সিঙ্গি ঘোষ, বীরকৃষ্ণ দাঁ, নীলমণি দত্ত, গোবিন্দরাম মিত্রর মতো ব্যক্তিদের নাম উঠে আসে। কিন্তু বারোয়ারি হলে কী হবে, কাঙালি, ভাট, ফকির গোত্রের লোকদেরও এই পুজোতে সামিল হওয়ার কোনও অধিকার ছিল না। বিসর্জন ঘিরে চলত আরও একপ্রস্থ নক্কারজনক ঘটনা। শবরোৎসবের আদলে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও সিদ্ধি-ভাঙ খেয়ে তারপর বেসুরো গাইতে গাইতে প্রতিমা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হতো ঘাটের দিকে। কিন্তু দুর্গাপুজোর মতো শুভ উৎসবে এত অনাচার সওয়া যায়? প্রশ্ন তুলেছিলেন তৎকালীন সমাজের দিকপাল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই। কেউ কেউ তো দৃঢ় বিশ্বাস করতেন এতে দেবী দুর্গা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেবেন। আসলে পুজোকে ঘিরে যতটা না ভক্তিভাব ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল বাবু সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এবং কালক্রমে সেটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মোটের উপর বলতে হয় বাবু সংস্কৃতির পুজো নিয়েও মধ্যবিত্তদের মনে যে অসন্তোষ ছিল, বারোয়ারি পুজো নিয়েও সেই একই বিরুদ্ধাভাবাপন্ন মনোভাব তাঁরা পোষণ করতেন। তবে বারোয়ারি পুজোর পাশাপাশি বাড়ির পুজোগুলোও তখন চলেছে রমরমিয়ে। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই এই দুই ধরনের পুজোর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

ভার্সেটাইল গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব হালদার

'ধন্যি মেয়ে'-এর 'যা যা বেহায়া পাখি যা না' কিংবা 'প্রথম কদম ফুল'-এর 'আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না' এসব গান আজও সংগীতপ্রিয় বাঙালির আবেগকে নাড়া দিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের সেই সময়টাকে, বাংলা সংগীতের ইতিহাসে যাকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ে ভারতীয় চলচিত্র পেয়েছিল একদল এক্সট্রিম প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক, গীতিকার, সুরকার, অভিনেতাসহ অসাধারণ কিছু সিনেস্টারদের। যাঁদের প্রায় অনেকেরই জন্ম এই বাংলায়। বাঙালির চেতনাকে সংগীতের সুরমূর্ছনায় রাঙিয়ে তুলেছিলেন এই সময়ের সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী থেকে শুরু করে গীতিকারেরাও। বাংলার ভার্সেটাইল লিরিসিস্ট পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন।

কিশোরকুমার তাঁকে 'পোলাওবাবু' নামে ডাকতেন, তিনি বাংলা সিনেমার চার দশকের সংবেদনশীল ও রোম্যান্টিক গীতিকার। তাঁর কলম থেকে আমরা পেয়েছি অসম্ভব ভালো সমস্ত গান। বাংলা ছায়াছবির দ্বিতীয় পর্বের সবাক যুগের দরাজদিল সম্রাট তিনি। ১৯৩১-এর ২ মে তিনি হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। পিতা

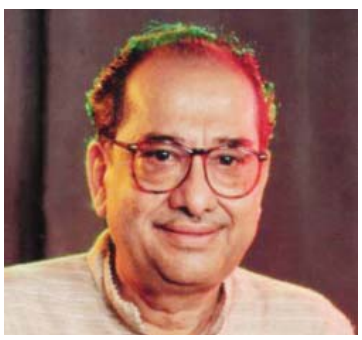

কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। সেসময়ের নির্বাক চলচিত্রে তিনি অভিনয় করতেন। সেই সূত্রেই বাড়িতে সিনেদুনিয়ার নক্ষত্রদের যাতায়াত লেগে থাকত। নাটক, সাহিত্য, সংগীতকলায় আত্মিকভাবে সম্পর্ক ছিল এই পরিবারের। আর বলাইবাহুল্য এই পরিবেশই গড়ে তুলেছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কবিতার প্রতি তাঁর টান ছেলেবেলা থেকেই। স্কুলে পড়ার সময় তিনি আনন্দবাজারে কবিতা লিখেছেন বহুবার। ক্লাস নাইনে তিনি প্রথম সিনেমার জন্য গান লেখেন। কাঁচা বয়েসেই তিনি বাংলা সিনেমায় গান লেখার কথা ভেবেছিলেন। তিনি প্রথম গান লিখে নিয়ে যান নিজেরই জামাইবাবু প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সেসময় সরোজবাবু 'অলকানন্দ', 'মনে ছিল আশা' প্রভৃতি চলচিত্রের সফল প্রোডিউসার হিসাবে পরিচিত। 'অভিমান' ছায়াছবির কাজ সেসময় তিনি সবেমাত্র শুরু করেছেন। সেই ছবিতেই সিচুয়েশনের সঙ্গে ম্যাচ খাইয়ে জীবনের প্রথম গানটি লিখে ফেললেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর করেছিলেন বোম্বের বিখ্যাত সুরকার রামচন্দ্র পাল। স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ার সময়েই কলকাতা বেতারের গার্স্টিন প্লেসের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। শুধু যে সেলুলয়েডের জন্যই তিনি গান লিখে গেছেন তা নয়, বাংলা থিয়েটারেও তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন অবলীলায়।

মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কুমার শানু, উদিত নারায়ণ কেউই বাদ থাকেননি তাঁর লেখা গানে ভোকাল দিতে। আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'লজ্জা, মরি মরি এ কী লজ্জা'ই হোক বা লতাজির গাওয়া 'আজ মন চেয়েছে' সব ধরনের ভার্সেটাইল কলমেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক মান্না দে-র সবচেয়ে পছন্দের গীতিকার। তাঁর লেখা প্রায় ১১২টি গানে মান্না দে কণ্ঠ দিয়েছেন। শোনা যায় সুরকার নচিকেতা ঘোষ একসময় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে নিয়ে একটি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন যা ছিল আদতে বাংলা সংগীতকে পরোক্ষভাবে আরও সমৃদ্ধ করার নয়া কৌশল। এসময়েই লেখা হয় 'এক বৈশাখে', 'বেঁধোনা ফুল মালা' প্রভৃতি বিখ্যাত গান। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'নচিকেতার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা আছে। ও তার একদিকে একবার আমায় চাপায় আর একবার অন্যদিকে আপনাকে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়)।'

ভারতীয় চলচিত্রে তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে তাকে নিয়ে তখন তৈরি হল নানান গসিপ। চলল ফিসফিসানি। আড়ালে-আবডালে গুজগুজ। ঠিক এই সময়েই ১৯৮১-র পুজোর গানে মান্না দের জন্য তিনি লিখলেন 'নিন্দুকে যা বলছে বলুক, তাতে তোমার কী আর আমার কী'।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। ১৯৬৪ এর 'অশান্ত ঘূর্ণি' সিনেমা থেকেই পুলক-হেমন্ত জুটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অসাধারণ সব গান লিখেছিলেন তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য। বাঙালির কান যেন পুজোর গানে তাঁদের শুনতে আগ্রহে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে তিনি হুগলি নদীতে লঞ্চ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শোনা যায় এসময় প্রায়শই তিনি গভীর ডিপ্রেশনে থাকতেন। খুব কাছের সম্পর্কগুলোকে তিনি অতি সহজেই ভেঙে যেতে দেখেছিলেন। এসময় তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ শেষ হয়ে এসেছিল। গভীর হতাশা ও অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। একদিকে ছিল সম্পর্কের পোড়া ছাই অন্যদিকে কলমের বন্ধ্যাত্ব। একদিকে যেমন দেখেছেন শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষের একাকিত্ব, আবার অন্যদিকে তিনি দেখেছেন গুরু দত্তের আত্মহত্যার পর গীতা দত্তের এলোমেলো হয়ে যাওয়া জীবনযাপন। দেখেছেন শ্যামল মিত্র ও উত্তমকুমারের নীরব চলে যাওয়া। এসব ভাবিয়েছে তাঁকে, ব্যথিত করেছে। কঠিন আঘাতে থেমে গেছে তাঁর কলম। মনের মতো আর লিখতে পারতেন না তিনি। শেষদিকে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতেন এখানে সেখানে। বাংলা সংগীত জগতে চার দশক ধরে রাজত্ব করেছেন তিনি। সংগীতের সেই স্বর্ণযুগকে চোখের সামনে শেষ হয়ে যেতে দেখতে পারেননি তিনি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকে কাতর মান্না দে লিখেছিলেন, 'পুলকের মতো জীবনরসিক লোক আত্মহত্যা করবে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অকল্পনীয় অনুভূতিগুলোর মধ্যে একটা।'

দেখা দিয়েই নিমেষে মিলিয়ে গেল ঘোড়াটা

সোমনাথ আদক

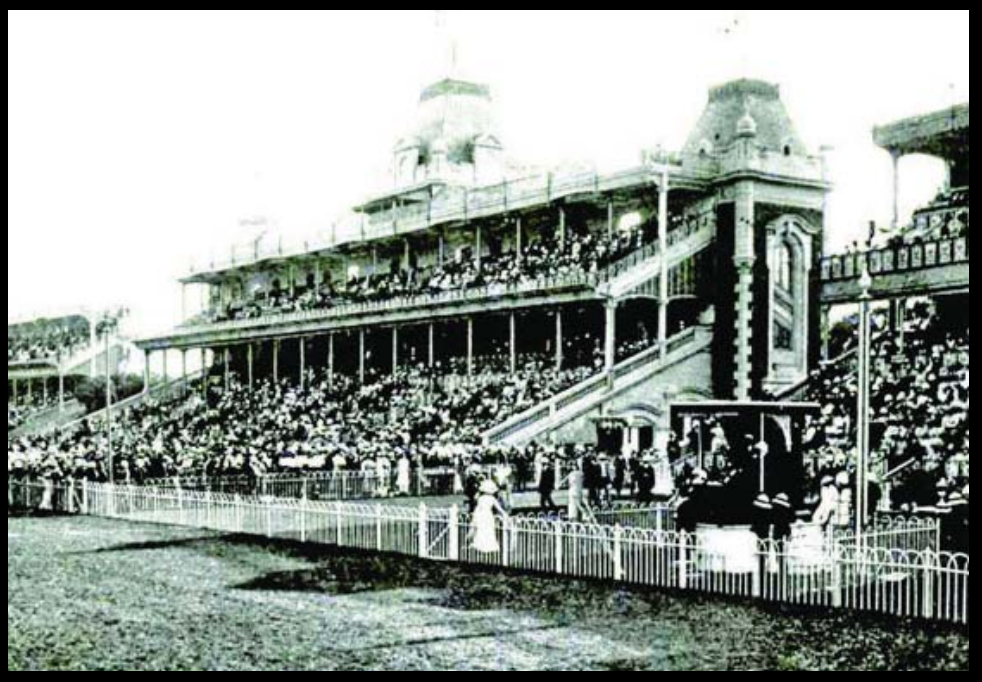

শহর থেকে বহুদূরে এটা কোনও পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ি কিংবা এই শহরের বুকে হেরিটেজ তকমা পাওয়া ব্রিটিশ আমলের কোনও বাড়ি বা রাজরাজড়াদের বিলাসী হাভেলি নয়। এটা কোনও শ্মশান কিংবা সুইসাইড স্কোয়াড নামে পরিচিত কোনও রেলওয়ে স্টেশন অথবা প্যারাডাইস অব সোল নামে পরিচিত কোনও কবরখানাও নয়— তবু সন্ধে হলেই এখানে নেমে আসে অদ্ভুত নীরবতা। হাওয়া ছাড়াই নড়ে ওঠে গাছের পাতা। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘন হয়ে আসে অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে আসে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা সাদা ঘোড়া একবার দেখা দিয়েই বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন হাওয়া বয় সর সর করে। নড়ে ওঠে গাছের পাতা। মনে হয় গাছগুলোও যেন হাঁটছে। কিন্তু ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনে তাকাবার সাহস হয় না কারও। তখন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক বা অতিসাহসীদেরও বেড়ে যায় হৃদপিণ্ডের গতি। আসলে তিন শতাব্দী কাটিয়ে ফেলা The City Of Joy কে ঘিরে যেমন রয়েছে নানা কাহিনি তেমনই এই শহরকে ঘিরে দেশ-বিদেশের মানুষের রয়েছে অদম্য কৌতূহল। তাই কল্লোলিনী কলকাতা কারও কাছে যেমন প্রণয়ের শহর তেমনই কোথাও কোথাও শিহরণেরও। এই শহরের আনাচে-কানাচে অলিতে-গলিতে কাহিনির মোড়কে কত যে ঘটনা ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই অনেকেই মনে করেন এই শহর শুধু আম-নাগরিকেরই নয়, এ শহর তেনাদেরও। যাদের দেখা যায় না চোখে, শুধু অনুভব করা যায় তাদের কথার ফিসফিস, নিঃশ্বাসের শব্দ। হ্যাঁ, এই শহরের আনাচে-কানাচে তারা ঘুরে বেড়ায়। কারা এরা? প্রশ্ন আছে, আছে পরতে পরতে রহস্য। আর আছে ইতিহাসের প্রবাহমান ঢেউয়ের মাথায় ফেনিয়ে ওঠা ঘটনার কিছু ইঙ্গিত। এমনি একটি রোমহর্ষক ঘটনায় কাহিনিতে মোড়া জায়গা হল রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব বা রয়্যাল কলকাতা গলফ ক্লাব।

কলকাতাবাসীদের সবসময়ই নানা ধরনের খেলার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। যেমন ক্রিকেট, ফুটবল, রেসলিং, পোলো, তেমনই ঘোড়া দৌড়। আর এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের কলকাতায় প্রথম রেসকোর্স তৈরি হয় ১৮২০ সালে। ১৮৪৭ সালে স্থাপিত হয় প্রথম হর্স রেসিং অর্গানাইজেশন ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব। পরে ১৯১১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানেই চলে ঘোড়া দৌড়। তাছাড়া নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শনিবারেও এখানে ঘোড়ার রেস অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় মুখরিত থাকা দি রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব খ্যাত রেসকোর্সের ময়দানটির কপালে ভাঁজ ফেলেছে 'হন্টেড' তকমা। দিনের আলোয় এই জায়গাটির তেমন সমস্যা না থাকলেও রাতের অন্ধকারে এখানেই ঘটে নানা অলৌকিক ঘটনা। কে বা কারা যেন রাতের অন্ধকারে ঘোড়া নিয়ে ছুটে যায় এখান দিয়ে। স্পষ্ট দেখা যায়, সাদা রঙের একটি ঘোড়া হঠাৎ দেখা দিয়ে নিমেষেই মিলিয়ে যায় বাতাসে। এই ঘটনার সঠিক কোনও ব্যাখ্যা কেউ দিতে না পারলেও প্রায় তিন শতাধিক বছরের পুরনো কলকাতার ইতিহাসে রয়েছে একটি শিহরণ জাগানো কাহিনী। শোনা যায়, রয়্যাল পরিবারের ব্রিটিশরা এখানে ঘোড় সওয়ার করতেন। ঘটনার সূত্রপাত জর্জ উইলিয়াম নামে এক ব্রিটিশ রেসারের থেকে। ১৯৩০ সাল নাগাদ জর্জ উইলিয়াম তার বিখ্যাল সাদা ঘোড়াটি এখানে ঘোরাতে আনতেন। তার অপরূপ সাদা ঘোড়াটির নাম ছিল প্রাইড। ঘোড়াটি ছিল রেসের মাঠের রানি। উইলিয়াম ঘোড়াটিকে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন কারণ ঘোড়াটি যেমন প্রচুর রেস জিতেছে তেমনই উইলিয়ামকে এনে দিয়েছে প্রচুর ট্রফি। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অত লড়াইয়ে আর জিততে পারত না পার্লা। একবার অ্যানুয়াল টার্ফি টুর্নামেন্টের আগে পার্ল আকস্মিকভাবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। উইলিয়াম তখন ঘোড়াটির বিশেষ যত্ন-আত্তি করলেও বিশেষ লাভ হয়নি। যার ফলাফল হিসাবে অ্যানুয়াল টার্ফি টুর্নামেন্টে হেরে যায় পার্লা। এরপরেই একদিন জর্জ দেখে খোলা ট্র্যাকের ওপর মরে পড়ে আছে তার সাদা ঘোড়াটি। পার্লের শোক আর মায়ায় জর্জও আর বেশিদিন বাঁচেননি। আর একটি তথ্য মতে, অ্যানুয়াল টার্ফি টুর্নামেন্ট হেরে যাওয়ার অবসাদে জর্জই নাকি গুলি করে খুন করে তার প্রিয় পার্লকে।

শোনা যায়, এখনও নাকি প্রত্যেক শনিবার পূর্ণিমার রাতে জর্জ আর পার্লকে দেখা যায় রেসের ময়দানের ট্র্যাকে। রেসকোর্স জুড়ে নাকি এখনও বীরবিক্রমে পরিক্রম করে প্রাইড। অনেকেই মনে করেন জর্জ উইলিয়াম সাহেবের সাদা ঘোড়া প্রাইড নাকি রেসের মাঠে আজও জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু রাত নামবার অপেক্ষা থাকে...

বেতারনাটক ও তার ইতিহাস

দুইয়ের পাতার পর

প্রসঙ্গক্রমে যখন বিকাশ রায়ের কথা উঠল, তখন বেতার নাটকে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু কথা জানাই। একসময় বিকাশবাবু প্রোগাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করতেন বেতারে। বেতার নাটকের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন নাটকের রিহার্সালে। সুবোধ ঘোষের 'শুন বরনারী' চলচ্চিত্রে যথেষ্ট হিট। সেই গল্প নিয়ে বেতার নাটকে অভিনয় করেছিলেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাশ প্রমুখ শিল্পী। নির্ধারিত দিনে নাটক রেকর্ডিং হল। মুশকিল হল এডিটিং করতে বসে। প্রযোজক অজিত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী ছিলেন তখন শুভপ্রকাশ দে। সংবাদ বিভাগ থেকে তিনি তখন সদ্য এসেছেন। এডিটিং করতে বসে তিনি সংলাপের মাস্টার টেপটি মুছে ফেলেন। অগত্যা অফিসের ওপর মহলের কাউকে কিছু না জানিয়ে পুনরায় সেই নাটকের রেকর্ডিং করা হল। এই পুনরায় রেকর্ডিঙের আগেরদিন থেকেই বিকাশবাবুর প্রায় ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। তা সত্ত্বেও কম্বলমুড়ি দিয়ে তিনি রেকর্ডিং করেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে অসুস্থতার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না।

শুধু বাংলা নয়, হিন্দিতেও পরিবেশিত হয়েছে বহু নাটক। হিন্দি বেতার নাটক যাঁর হাতে অন্যমাত্রা পায় তিনি হলেন দীপনারায়ণ মিঠোলিয়া। '৬৪-'৬৮ সালের মধ্যে প্রচারিত কয়েকটি জনপ্রিয় হিন্দি নাটক হল 'চৌকিদার', 'ইনসান', 'বুলবুলা', 'রোটি ঔর বেটি', 'উল্টাসুস্টা' প্রভৃতি। ১৯৭৫ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে চালু হয় সাঁওতাল বিভাগ। সেখানেও প্রচারিত হয় সাঁওতাল ভাষার নাটক। এই বিভাগে সফল প্রযোজক হিসাবে পাওয়া যায় যদুনাথ টুডু, নির্মলচন্দ্র গুহ, নীভা টুডু, সুশীল হেমব্রম, রাবণ বাস্কে প্রমুখকে। যদুনাথ টুডু প্রযোজিত সমীরকুমার মুর্মু রচিত 'টুআর' নাটকটি ১৯৭৮ সালে আকাশবাণীর বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। বেতার নাটকের ইতিহাসে যুববাণী প্রচারিত নাটকও উল্লেখযোগ্য।

বেতারের শুরু থেকেই জনপ্রিয় হয়েছে বেতার নাটক। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই (সবার নাম বলা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব হল না) বেতার নাটকে অভিনয় করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র বেতার নাটকের জন্যই অভিনেতা তৈরি হয়েছে। হয়তো বেতারে অন্য কোনও কাজে এসে নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন এমনও দেখা গেছে। বেতার নাট্য রচনার প্রতিযোগিতা হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নাটকের পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। সেই সব পুরস্কৃত নাটক অভিনীতও হয়েছে। সরাসরি অভিনয়ে, মাইক্রোফোনের সামনে ভুল বলার মজা থেকে আরম্ভ করে রেকর্ডবদ্ধ অভিনয়, সব কটি পদক্ষেপ পেড়িয়ে আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় এই বেতার নাটকের ইতিকথার ইতি এখানেই টানতে হচ্ছে। জানি রয়ে গেল বহু না বলা কথা। সময় মতো পরে আবার কখনও এই বিষয়ে কলম ধরা যাবে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া - ৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

শহরটা অনেক মূল্যবান স্মৃতির কোলাজ

রিয়াজ নাসের পলাশ (সাহিত্যিক)

কলকাতা শব্দটার ভেতরেই কেমন একটা অন্তরের টান আছে। কলকাতা আমার কাছে একটা স্বপ্নের শহর। কলকাতার এমন কিছু জায়গা আছে যেগুলো আমার খুবই প্রিয় জায়গা যেমন প্রিন্সেপ ঘাট, ভিক্টোরিয়া, গড়ের মাঠ কত নাম বলব! এই শহরটাতে গিয়ে কখনও মনে হয়নি আমি দেশের বাইরে আছি।

প্রথম যখন কলকাতায় যাই তখন সবেমাত্র দু'চার কলম লিখছি। যাঁকে আমি গুরুদেব মানি, যাঁর সান্নিধ্যে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি সেই কবি শামসুর রাহমানের সাথে প্রথম কলকাতায় যাওয়া। সময় স্রোতের মতো এগিয়ে গেছে। সেইসময়ের অনেক প্রিয়জনই এখন আর পৃথিবীতে নেই। তবু কলকাতা আছে হৃদপিণ্ডের মাঝখানেই। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। কবি শামসুর রাহমানের চ্যালা হয়ে চললাম কলকাতা।

প্রথম পা রেখেই যাকে চাক্ষুষ দেখলাম তিনিও বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠলাম আমরা। এত রাস্তা জার্নি করার ধকল নিমেষে উবে গেল। এতজন প্রিয় কবিসাহিত্যিকদের সাথে এমন মুহূর্ত কলকাতাই প্রথম আমায় উপহার দিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম বালিগঞ্জে শামসুর ভাই-এর এক রিলেটিভের ফ্ল্যাটে। সেখানে সেদিন রাতে থেকে পরের দিন নন্দন চত্বরে সেই অসম্ভব সুন্দর সাহিত্য সন্ধ্যার সাক্ষী হলাম। সত্যিই এ এক অমোঘ প্রাপ্তি। অনেক অনুষ্ঠানেই কবিতাপাঠ করেছিলাম সেই বয়সেও, তবে এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্যই আলাদা। তাই কলকাতার কথা মনে পড়লে প্রথম আলাপ হওয়া কলকাতাকেই বেশি মনে পড়ে।

এরপর বহুবার কলকাতা গেছি কখনও সাহিত্যের অনুষ্ঠানে, কখনও ব্যক্তিগত কাজে। সত্যিই শহরটাতে একটা অদ্ভুত মোহ আছে। ২০১২ নাগাদ কলকাতা গিয়েছিলাম একটু সময় নিয়ে। শহরটাকে ঘুরে দেখেছি মনের মতো করে। আমার অনেক বন্ধুই আছেন ওপার বাংলায়। সেই কটা দিন অনেকের সাথে আড্ডা হয়েছে। একসাথে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতাযাপনও হয়েছে। কলকাতার এমন কোনও বিখ্যাত জায়গা নেই, যেখানে আমি যাইনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে যাদুঘর, সায়েন্স সিটি থেকে কুটিঘাট, বিবাদি বাগ থেকে হাওড়া ব্রিজ সবই আমার প্রিয় জায়গার তালিকায় রয়েছে। প্রিন্সেপ ঘাট বা বাবুঘাটের গঙ্গার পাড় আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। ওখানে গেলে আমি তৃপ্তি পাই। মনের ভেতর অদ্ভুত প্রশান্তি বিরাজ করে। কলকাতা শহরটার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে শহরটা নিজেকে বদলাতে বদলাতে গেছে। একটা জায়গার সাথে আরেকটা জায়গার তেমন মিল নেই। আমার মনে হয় অনেকগুলো স্বতন্ত্র স্বপ্ন নিয়েই গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরটা। এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে শহরটাতে, ওগুলো একটা-আধটা স্বপ্নের চাইতে কম কী!

অনেক প্রসন্নতা আছে কলকাতা নিয়ে। অনেক ভালোলাগা। অনেক মূল্যবান স্মৃতির কোলাজ কলকাতা। যতবার গেছি ততবার মুগ্ধ হয়েছি।

ফোটো: সুজিত জানা

বিজ্ঞানী স্যার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

প্রতীপ হালদার

একসময় 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'একজন খাঁটি বাঙালি লন্ডনে সমাগত, চমৎকৃত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন— এ দৃশ্য অভিনব।' তিনি আর কেউ নন, এই উপমহাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রথম বিজ্ঞানী স্যার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বর্তমান বাংলাদেশে পরিবারের মূল বাসস্থান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে থাকলেও ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু সেসময় ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি আর সবার মতো নিজের ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাননি। জগদীশচন্দ্রের প্রথম স্কুল ছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। পরে তিনি ১৮৬৯ সালে কলকাতায় চলে এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করে ১৮৭৫ সালে এন্ট্রান্স পাস করে ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে ভর্তি হন ১৮৮০ সালে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বন্ধ হয় সেই ডাক্তারি পড়া। এরপর কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ট্রাইপস পাশ করেন। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অস্থায়ী অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। ভারতীয় হওয়ায় সেখানে তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হয় ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের অর্ধেক। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে দীর্ঘদিন তিনি কোনও বেতন না নিয়েই শিক্ষকতা করেন এবং অন্যদের চেয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন। এতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তিন বছরের ন্যায্য পাওনা বেতন পরিশোধ করে আর তার চাকরিও স্থায়ী করা হয়। তখন থেকেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতনের বৈষম্য দূর হয়।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠেরো মাসে তিনি যে সকল গবেষণা করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই গবেষণাপত্রগুলোর সূত্র ধরেই ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। একই গবেষণায় ইংল্যান্ডের লিভারপুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। ওই বক্তৃতার সাফল্যের পর তিনি বহু স্থান থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পান। এর মধ্যে ছিল রয়াল ইনস্টিটিউশন, ফ্রান্স ও জার্মানি।

তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম হল— উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাপক যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ, উদ্ভিদের দেহের উত্তেজনার বেগ নিরূপক সমতল তরুলিপি যন্ত্র রিজোনাস্ট রেকর্ডার ইত্যাদি। এভাবে তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে গাছের প্রাণ আছে।

উপমহাদেশে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি তাঁর হাতেই প্রথম সূচিত হয়। তিনি উপমহাদেশের তখন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমেরিকান পেটেন্টের (সরকারি অনুমতি বা লাইসেন্স যা আবিষ্কারের উপর আবিষ্কারকের স্বত্বাধিকার নির্দেশ করে) অধিকারী।

এর আগে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে এই পেটেন্ট নিয়েই। তখন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই ইলেকট্রিক রেডিয়েশন বিষয়ে গবেষণার সাথে সাথেই বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে শব্দকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কীভাবে পাঠানো যায় সে বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। একই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন আমেরিকার বিজ্ঞানী লজ, ইতালিতে মার্কনি। কিন্তু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী। জগদীশচন্দ্রের আঠারো মাসের সেই গবেষণার মধ্যে মুখ্য ছিল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে মাত্র ২৪ বর্গফুট একটি ছোট ঘরে এ-বিষয়ে পরীক্ষা করেন। বেতার যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কলকাতার টাউন হলে সাঁইত্রিশ বছরের যুবক জগদীশ যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হয়ে আমন্ত্রিত শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, সর্বসমক্ষে তা পরীক্ষা করে দেখাতে চান। এরপরেই তিনি বিনা তারে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে কলেজে সংকেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন। এ ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ। আধুনিক র‍্যাডার, টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান ঘটে থাকে।

Wireless telegraphy সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার ইংল্যান্ডে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। একটি বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানি তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করে Wireless telegraphy বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করতে সক্ষম হয়। তখন অর্থনৈতিক কারণে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ব্যাহত হয়েছিল কিছুদিন। ১৮৯৬ সালে মার্কনী Wireless telegraphy-র প্রথম পেটেন্ট নিলেন।

বাঙালিরাও যে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নিউটন-আইনস্টাইনের চেয়ে কম যান না, তিনি তা প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে নিজেই বলেছিলেন— 'জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনওটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।'

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে রেসপন্সেস ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং (১৯০২), প্লান্ট রেসপন্সেস অ্যাজ এ মিনস অব ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস (১৯০৬), কম্পারেটিভ ইলেকট্রফিজিওলজি (১৯০৭), নার্ভাস মেকানিজম অব প্লান্টস (১৯২৫), কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপার্স (১৯২৭), মোটর মেকানিজম অব প্লান্টস (১৯২৮) ও গ্রোথ অ্যান্ড ট্রপিক মুভমেন্ট ইন প্লান্টস (১৯২৯)। বাংলায় ছোটদের জন্য চমৎকার গদ্যে লিখেছেন 'অব্যক্ত' নামে একটা বই।

তিনি জীবদ্দশায় অনেকগুলো সম্মাননা লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নাইটহুড' (১৯১৬) ও রয়াল সোসাইটির ফেলো (১৯২০)। তিনি লিগ অব নেশনস কমিটি ফর ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সাইন্সেস অব ইন্ডিয়ার (বর্তমানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি) প্রতিষ্ঠাতা ফেলো। বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখেন তিনিই।

কিন্তু এখনও যুগ ক্রমশ এগিয়ে চললেও তাঁর আবিষ্কার, তাঁর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' গবেষণালয় চিরস্মরণীয়। বিজ্ঞানের নানাদিকে তাঁর অবাধ বিচরণ এখনও বর্তমান গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুনিপুণভাবে।